ভূতের সেকাল ভূতের একাল

স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায়

পুনশ্চ
৯এ, নবীন কুণ্ডু লেন
কলকাতা-৭০০ ০০৯

একটু থামুন প্লিজ !!

আচ্ছা, আপনি কি ভূত মানেন?

যদি মানেন—

তবে এ বই আপনার জন্যে!

যদি না মানেন —

তাহলেও এ বই আপনার জন্যে!

কারণ —

এই বইতে আছে

সেকালের ভূত বিশারদ

রসসাহিত্যিক **ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের**

'লুল্লু'!

আর—

ভূতের ব্যাগার খাটা

একালের লেখক

স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায়ের

'লুল্লু ভূতের তৃতীয় পুরুষ'!

তবে উপন্যাস দুটি সত্যি সত্যি

কত পারসেন্ট ভৌতিক/অধিভৌতিক

অথবা কিম্ভৌতিক —

বিচার করবেন আপনি।

তাই —

এ বই আপনাকে পড়তেই হবে!!

"ভারতের ভূতকুল ও ডাইনিকুল আজ
মৌনী ও ম্রিয়মাণ। শ্মশান-মশান
আজ নীরব। রাত্রি দুই প্রহরের
সময় জনশূন্য মাঠের মাঝখানে,
আকাশপানে পা তুলিয়া জিহ্বা লক-
লক করিয়া চারিদিকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া
সেকালে ডাইনিরা যে চাতর করিত
আজ আর সে চাতর নাই।
মরি! মরি! ভারতের সকল গৌরবই
একে একে লোপ হইল।"

ভূতের সেকাল

ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়

লুল্লু

প্রথম প্রকাশকাল

'জন্মভূমি' পত্রিকায়

ফাল্গুন, ১২৯৮

প্রথম অধ্যায়

চুরি

"লে লুল্লু" আমির সেখের মুখ দিয়া যখন এই কথা দুইটি নির্গত হইল, তখন তিনি জানিতেন না, ইহাতে কী বিপত্তি ঘটিবে। কথা দুইটি আমিরের অদৃষ্টে বজ্রাঘাতরূপে পতিত হইল। আমিরের বাটী দিল্লি শহরে, আমির জাতিতে মুসলমান। একদিন অন্ধকার রাত্রিতে আমিরের বিবি একেলা বাহিরে গিয়াছিলেন। পরিহাস করিয়া, স্ত্রীকে ভয় দেখাইবার নিমিত্ত আমির ভিতর হইতে বলিলেন, — "লে লুল্লু।" অর্থাৎ কি না, "লুল্লু! তুই আমার স্ত্রীকে ধরিয়া লইয়া যা।" লুল্লু, কোনও দুরন্ত বাঘেরও নাম নয়, কিংবা ছুরিধারী কানকাটারও নাম নয়। "লুল্লু" একটি বাজে কথা, ইহার কোনো মানে নাই, অভিধানে ইহা দেখিতে পাওয়া যায় না, পরিহাস করিয়া আমির কেবল কথাটি যোড়-তাড় করিয়া বলিয়াছিলেন।

কিন্তু যখন বিপত্তি ঘটে, তখন কোথা হইতে যেন উড়িয়া আসে। আশ্চর্যের কথা এই, লুল্লু একটি ভূতের নাম ছিল। আবার, দৈবের কথা শুন, লুল্লু সেই রাত্রিতে, সেই মুহূর্তে, আমিরের বাটীর ছাদের আলিশার উপর পা ঝুলাইয়া বসিয়াছিল। হঠাৎ কে তাহার নাম ধরিয়া ডাকিল। সে চমকিয়া উঠিল শুনিল,— কে তাহাকে কি লইতে বলিতেছে; চাহিয়া দেখিল, সম্মুখে এ পরমাসুন্দরী নারী। তাহাকেই লইয়া যাইবার নিমিত্ত লুল্লুকে অনুরোধ করা হইতেছে। এরূপ সামগ্রী পাইলে দেবতারাও তদ্দণ্ডে নিকা করিয়া ফেলেন, তা ভূতের কথা ছাড়িয়া দিন। চকিতের ন্যায়, দুর্ভাগা রমণীকে লুল্লু আকাশপথে কোথায় যে উড়াইয়া লইয়া গেল, তার আর ঠিক নাই।

আমির, ঘরের ভিতর থাকিয়া মনে করিতেছিলেন, স্ত্রী এই আসে। এই আসে, এই আসে করিয়া অনেকক্ষণ হইয়া গেল, তবুও তাঁহার স্ত্রী ফিরিয়া আসিলেন না। তখন তাঁহার মনে ভয়ের সঞ্চার হইল; তখন তিনি স্ত্রীকে ডাকিলেন, কিন্তু সাড়াশব্দ কিছুই পাইলেন না। বাহিরে নিবিড় অন্ধকার, নিঃশব্দ। বাহিরে আসিয়া, এখানে-ওখানে চারিদিকে স্ত্রীকে খুঁজিলেন, কোথাও দেখিতে পাইলেন না। তবুও মনে এই আশা হইল, স্ত্রী বুঝি তামাসা করিয়া কোথাও লুকাইয়া আছে। তাই, পুনরায় প্রদীপ হাতে করিয়া আতি-পাতি করিয়া সমস্ত বাড়ি অনুসন্ধান করিলেন, বাড়ির ভিতর স্ত্রীর নাম-গন্ধও নাই। আবার আশ্চর্যের কথা এই যে, বাড়ির দ্বার বন্ধ। সন্ধ্যাকালে নিজে তিনি যেরূপ বন্ধ করিয়াছিলেন, সেইরূপ বন্ধই রহিয়াছে। তবে তাঁহার স্ত্রী কোথায় যাইলেন? পতিব্রতা সতীসাধ্বী আমির-রমণী বাড়ির বাহিরে কখনই পদার্পণ করিবেন না। আর যদিও তাঁহার এরূপ কুমতি হয়, তাহা হইলে দ্বার খুলিয়া তো' যাইতে হইবে! দ্বার তো' আর ফুড়িয়া যাইতে পারেন না। দারুণ কাতর হইয়া আমির এইসব চিন্তা করিতে লাগিলেন। আমিরের চক্ষু হইতে বুক বহিয়া

---

* মূল উপন্যাসের ভাষা অপরিবর্তিত। বানানের ক্ষেত্রে যথাসম্ভব আধুনিক ধারা অনুসরণ করা হয়েছে।

অবিরত জল পড়িতে লাগিল। প্রিয়তমা গৃহলক্ষ্মীকে গৃহে না দেখিয়া গৃহ শূন্য, জগৎ শূন্য, হৃদয় শূন্য, — আমীর সবই শূন্য দেখিতে লাগিলেন। কেবল শূন্য নয়, গ্রীষ্মকালের আতপতাপিত বালুকাময় মরুভূমির ন্যায় ধূ-ধূ করিয়া হৃদয় তাঁহার জ্বলিতে লাগিল। "আমি আমার অমূল্য নারী-রত্নকে আপন হাতেই বিলাইয়া দিলাম; আমার কথামত তাহাকে জিনেই লইয়া গেল, কি ভূতেই লইয়া গেল, কি স্বয়ং শয়তান আসিয়াই লইয়া গেল, কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। হায়! হায়! কী হইল!" এইরূপে আমির নানাপ্রকার খেদ করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। অবশেষে চক্ষু মুছিয়া, দ্বার খুলিয়া পাড়া-প্রতিবাসীকে ডাকিলেন। পাড়া-প্রতিবাসীরা সকলে দৌড়িয়া আসিল। সকলেই পুনরায় তন্ন তন্ন করিয়া আমিরের বাটী অন্বেষণ করিল। আমিরের বাটী দেখিবার পর, পাড়ার এ-ঘরে ও-ঘরে যথাবিধি অন্বেষণ হইল। গলি-ঘুঁজি সকল স্থানই দেখা হইল। খুঁজিতে আর কোথাও বাকি রহিল না, কিন্তু আমিরের স্ত্রীকে কেহই খুঁজিয়া পাইলেন না। প্রতিবাসীরা ক্রমে কানাকানি করিতে আরম্ভ করিল, নিশ্চয় আমিরের বিবি কোনও পুরুষের সঙ্গে বাহির হইয়া গিয়াছে। এরূপ সুন্দরী নব-যৌবনা রমণী আফিমচীর ঘরে কত দিন থাকিতে পারে? আমির একটু একটু পাকা-আফিম খাইতেন, তাঁহার এই দোষ। এক তো স্ত্রী গেল, তারপর যখন এই কলঙ্কের কথা আমিরের কানে উঠিল, আফিমচী হউন, তখন তাঁহার হৃদয়ে বড়োই ব্যথা লাগিল। তিনি ভাবিলেন,— "দূর হউক, এ সংসারে আর থাকিব না, লোকের কাছে আর মুখ দেখাইব না, ফকিরী লইয়া দেশে দেশে বেড়াইব, যদি সে প্রিয়তমা লায়লারূপী সাধ্বীকে পুনরায় পাই, তবেই দেশে ফিরিয়া আসিব, না হইলে মজনুর মতো এ ছার জীবন একান্তই বিসর্জ্জন দিব।"

এইরূপ ভাবিয়া-চিন্তিয়া, ফকিরের বেশে আমির ঘর হইতে বাহির হইলেন। সঙ্গে কিছুই লইলেন না;— লইলেন কেবল একটি টিনের কৌটা, একটি বাঁশের নল, আর একটি লোহার টেকো। আমির কিছু শৌখিন পুরুষ ছিলেন। টিনের কৌটার ঢাকনের উপর কাচ দেওয়া ছিল, আর্‌সির মতো তাহাতে মুখ দেখা যাইত। পান খাইয়া আমির তাহাতে কখন কখন মুখ দেখিতেন, ঠোঁট লাল হইল কি না। বাঁশের নলটি তাঁহার বড়োই সাধের জিনিস ছিল। এক সাহেবের সঙ্গে খানসামা হইয়া একবার তিনি পাহাড়ে গিয়াছিলেন, সেইখানে এই শখের জিনিসটি ক্রয় করেন। ইহার গায়ে হিজি-বিজি কালো-কালো অনেক দাগ ছিল। আমির মনে করিতেন, নলের সেগুলি অলঙ্কার, তাই সেই হিজি-বিজিগুলির বড়োই গৌরব করিতেন। বস্তুত, কিন্তু সেগুলি অলঙ্কার নহে, সেগুলি অক্ষর,— চিনভাষার অক্ষর। তাহাতে লেখা ছিল,— "চিনদেশীয় মহাপ্রাচীরের সন্নিকট লিংটিং শহরের মোপিঙ নামক কারিগরের দ্বারা এই নলটি প্রস্তুত হইয়াছে। নল-নির্মাণ কাজে মোপিঙ অদ্বিতীয় কারিগর, জগৎ জুড়িয়া তাঁহার সুখ্যাতি। মূল্য চারি আনা। যাঁহার নলের আবশ্যক হইবে, তিনি তাঁহারই নিকট হইতে যেন ক্রয় করেন, বাজে মেকরদিগের কাছে গিয়া যেন বৃথা অর্থ নষ্ট না করেন। মোপিঙের নল ক্রয় করিয়া যদি কাহারও মনোনীত না হয়, তাহা হইলে নল ফিরাইয়া দিলে, মোপিঙ তৎক্ষণাৎ মূল্য ফিরাইয়া দিবেন।" যাহা হউক, আমির যে নলটি কিনিয়াছিলেন, মনের মতো হইয়াছিল তাই রক্ষা। না হইলে, মূল্য ফেরত লইতে হইত। যুধিষ্ঠির যে পথ দিয়া স্বর্গে গিয়াছিলেন, সেই তুষারময় হিমগিরি অতিক্রম করিয়া, তিব্বতের

পর্বতময় উপত্যকা পার হইয়া, তাতারের সহস্র ক্রোশ মরুভূমি চলিয়া চিনের উত্তরসীমায় লিংটিং শহরে আমিরকে যাইতে হইত, সেখানে যাইলে তবে মোপিঙের সহিত সাক্ষাৎ হইত, মোপিঙ সিকিটি ফিরাইয়া দিতেন। তাই বলি, ধর্মে রক্ষা করিয়াছে যে, নলটি আমিরের

বাঁশের নলটি দিয়া চণ্ডুর ধুম পান করিতেন।

মনোনীত হইয়াছিল। এত মনোনীত হইয়াছিল যে, প্রতিদিন ইহাতে অতি যত্নে আমির তৈল মাখাইতেন। তেল খাইয়া খাইয়া, পাকিয়া, ইহা ঈষৎ রক্তিমাবর্ণ হইয়াছিল। কৌটার ভিতর বড়োই সাধের ধন, আমিরের প্রস্তুত করা আফিম থাকিত, ইতর ভাষায় যাহাকে লোকে চণ্ডু বলে। বাঁশের নলটি দিয়া চণ্ডুর ধূম পান করিতেন। টেকো দ্বারা কৌটা হইতে আফিম তুলিয়া নলের আগায় রাখিতেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়

রোজা

এই সকল সরঞ্জাম লইয়া আমির গৃহ হইতে বাহির হইলেন। দিল্লি পার হইলেন, কত নদ-নদী, গ্রাম-প্রান্তর অতিক্রম করিলেন। দিনের বেলায় ভিক্ষা করিয়া খান, সন্ধ্যা হইলে, গাছতলায় হউক, কী মাঠে হউক, পড়িয়া থাকেন। খোদা খোদা করিয়া কোনোমতে রাত্রি কাটান। এইরূপে কতদিন অতিবাহিত হইয়া গেল। স্ত্রীকে পুনরায় পাইবার আশা আমিরের মন হইতে ক্রমেই অন্তর্হিত হইতে লাগিল। হয় ফকিরী করিয়া সমস্ত জীবন কাটাইতে হইবে, না হয় একটা বুড়োহাবড়া নিকা করিয়া পুনরায় ঘরকন্না করিতে হইবে, এই ভাবিয়া শোকে তিনি নিতান্তই আকুল হইয়া পড়িলেন। একদিন তিনি একটি গ্রামে গিয়া উপস্থিত হইলেন। সেখানে একজনদের বাটীর সম্মুখে অনেকগুলি লোক বসিয়া আছে দেখিলেন। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন যে, সে গ্রামটি পশ্চিমের চক্রবেড়বিশেষ। যেখানে লোক বসিয়াছিল, সেটি জানের বাড়ি। গৃহস্বামী একজন প্রসিদ্ধ গণৎকার। ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্তমান সকলেই প্রত্যক্ষ দেখিতে পান। সংসারে তাঁহার কাছে কিছুই গুপ্ত নাই। অদৃষ্টের লিখন তিনি জলের মতো পড়িতে পারেন। সামুদ্রিকে হনুমানের চেয়ে ব্যুৎপত্তি। ললাটে কী হাতে, যে ভাষায় বিধাতা কেন আঁচড়-পিচড় পাড়িয়া থাকুন না,— ইংরেজিতে হউক, কি

ফারসিতে হউক, দেবভাষায় হউক, কি দানব ভাষায় হউক, — সকলই তিনি অবাধে পড়িতে পারেন। চুরি-জুয়াচুরি সকলই বলিয়া দিতে পারেন। অবোধ গভর্নমেন্ট যদিও তাঁহাকে একটিও পয়সা, কি একটিও টাইটেল দেন নাই সত্য, কিন্তু দূর-দূরান্তর হইতে তাঁহার নিকট লোক আসিয়া থাকে। পাঁচটি পয়সা আর পাঁচ ছটাক আটা দিয়া ভূত-ভবিষ্যৎ গণাইয়া লয়। আমির বলিলেন,— "আমিও জানের বাড়ি যাই, ইন্‌শাল্লাতালা! কে আমার বিবিকে লইয়া গিয়াছে, সে গণিয়া দিবে।" আমীর গিয়া জানের বাটির সম্মুখে বসিলেন। অন্যান্য লোকের গণা-গাঁথা হইয়া যাইলে, অতি বিনীতভাবে গণৎকারের নিকট তিনি আপনার দুঃখের কথা আগাগোড়া বলিলেন। গণৎকার ক্ষণকালের নিমিত্ত গাঢ় চিন্তায় নিমগ্ন হইলেন। অবশেষে চারিখানি খাপ্‌রা হাতে লইলেন। মন্ত্র পড়িয়া সেই চারিখানি খাপরায় ফুঁ দিতে লাগিলেন। যখন মন্ত্র পড়া আর ফুঁ দেওয়া হইয়া গেল, তখন একখানি উত্তরদিকে, একখানি দক্ষিণে, একখানি পূর্ববদিকে, আর একখানি পশ্চিমে ছুড়িয়া ফেলিলেন। তারপর কিয়ৎক্ষণের নিমিত্ত চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন,— "ফকিরজি! আপনার স্ত্রীর সন্ধান পাইয়াছি। আপনার স্ত্রীকে ভূতে লইয়া গিয়াছে। কিন্তু করিব কী! আমি ভূতের রোজা নই। ভূতের উপর আমার কিছুমাত্র অধিকার নাই। যদি থাকিত, তাহা হইলে এতক্ষণ কোন্‌কালে আপনার স্ত্রীকে আনিয়া দিতাম। তবে আপনাকে সন্ধান বলিয়া দিলাম। আপনি এক্ষণে একটি ভালোরোজার অনুসন্ধান করুন। ভালো রোজা পাইলে নিশ্চয় আপনার স্ত্রীকে ভূতের হাত হইতে উদ্ধার করিতে পারিবেন।" এইরূপে আশ্বাস পাইয়া আমিরের মন কথঞ্চিৎ সুস্থ হইল। তাঁহার স্ত্রী যে কোনো দুষ্ট লম্পটের কুহকে পড়িয়া ঘর হইতে বাহির হয় নাই, এ দুঃখের সময় তাহাও শান্তির কারণ হইল।

এখন রোজা চাই। কিন্তু ইংরেজের প্রভাবে আমাদের সকল ব্যবসাই একরূপ লোপ পাইয়াছে। অন্য ব্যবসার কথা দূরে থাকুক, ভূতদিগের ভূতে পাওয়া ব্যবসাটি পর্যন্ত লোপ হইয়া গিয়াছে। এই হতভাগা দেশের লোকগুলো এমনই ইংরেজিভাবাপন্ন হইয়াছে যে, কাহাকেও ভূতে পাইলে কি ডাইনে খাইলে, বলে কি না হিস্টিরিয়া হইয়াছে! এ কথায় রক্তমাংসের শরীরে রাগ হয়, ভূতদেহে তো রাগ হইবেই। তাই ঘৃণায় ভূতকুল একবাক্য হইয়া বলিল,— "দূর হউক, আর কাহাকেও পাইব না।" ডাইনিকুল একবাক্য হইয়া বলিল,— "দূর হউক, আর কাহাকেও খাইব না।" ভারতের ভূতকুল ও ডাইনিকুল আজ তাই মৌনী ও ম্রিয়মাণ। শ্মশান-মশান আজ তাই নীরব! রাত্রি দুই প্রহরের সময়, জনশূন্য মাঠের মাঝখানে, আকাশপানে পা তুলিয়া জিহ্বা লক্-লক্ করিয়া, চারিদিকে ঘুরিয়া-ঘুরিয়া সেকালে ডাইনিরা যে চাতর করিত, আজ আর সে চাতর নাই। মরি! মরি! ভারতের সকল গৌরবই একে একে লোপ হইল! এ অবস্থায় আর রোজার ব্যবসা কী করিয়া চলিবে? তাহাও একপ্রকার লোপ হইয়াছে। নানা স্থানে কত শত গঙ্গা ময়রার ঘরে আজ অন্ন নাই। পায়ের উপর পা দিয়া, সোনাদানা পরিয়া, যাহারা সুখে-স্বচ্ছন্দে কাল কাটাইত, আজ তাহারা পথের ভিখারি। আমির দেখিলেন, ভালো রোজা পাওয়া বড়ো সহজ কথা নয়। আমির কিন্তু হতাশ হইবার ছেলে ছিলেন না। মনে করিলেন যে,— "যদি আমাকে পৃথিবী উলট-পালট করিয়া ফেলিতে হয়, তাহাও আমি করিব, যেখানে পাই সেইখান থেকে ভাল রোজা নিশ্চয় বাহির করিব।" এই বলিয়া তিনি

পুনরায় দেশপর্যটনে প্রবৃত্ত হইলেন। যেখানে যান, সেইখানেই সকলকে জিজ্ঞাসা করেন,— "হাঁগা! তোমাদের এখানে ভালো ভূতের রোজা আছে?" ছোটোখাটো অনেক রোজার সঙ্গে দেখাও হইল। অনেক মুসলমান আসিল, যাঁহারা তাবিজ লিখিয়া ভূত-প্রেত-দানো-দৈত্যকে দূর করেন, তাঁহাদেরও সহিত সাক্ষাৎ হইল। কিন্তু মনের মতো কাহাকেও পাইলেন না; বুক ফুলিয়া কেহই বলিতে পারিল না যে,— "ভূত মারিয়া আমি তোমার স্ত্রীকে আনিয়া দিব।" অবশেষে অনেক পথ, অনেক দূর যাইয়া আমির একটি গ্রামে গিয়া পৌঁছিলেন। সেই গ্রামে প্রথমেই একটি বৃদ্ধার সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। আমির যথারীতি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, —"হাঁগা! তোমাদের এখানে ভালো রোজা আছে?" বৃদ্ধা উত্তর করিল,— "হাঁ বাছা আছে। আমাদের গ্রামের মহাজনের কন্যাকে সম্প্রতি একটি দুর্দান্ত ভূতে পাইয়াছিল। মহাজনের টাকার আর অবধি নাই। সে যে কত ডাক্তার, কত বৈদ্য, কত হেকিম, কত রোজা আনিয়াছিল, তাহার আর কী বলিব, দু'পা দিয়া জড় করিয়াছিল। কিন্তু কিছুতেই কিছু হয় নাই, কেহই সে ভূত ছাড়াইতে পারে নাই। অবশেষে এই গ্রামের একজন দরিদ্র ব্রাহ্মণ একটি মন্ত্র পড়িয়াই তাহাকে আরোগ্য করেন। ব্রাহ্মণ পূর্বে খাইতে পাইত না, ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণীর উদরে অন্ন ছিল না, অঙ্গে বস্ত্র ছিল না, এখন অন্ন-বস্ত্রের কথা দূরে থাকুক, দ্বারে হাতি, ঘোড়া, উট বাঁধা।"

তৃতীয় অধ্যায়

তাঁতি

বলা বাহুল্য, আমির এই কথা শুনিয়া অবিলম্বে ব্রাহ্মণের দ্বারে গিয়া উপস্থিত হইলেন। ব্রাহ্মণের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া, ঝুঁকে সেলাম করিয়া, তাঁহাকে আদ্যোপান্ত আপনার দুঃখের কাহিনি বলিলেন। ব্রাহ্মণ বলিলেন — "দেখ, ভূতে পাইলে আমি ছাড়াইতে পারি। ভূতে যদি কাহাকেও একবারে উড়াইয়া লইয়া যায়, তাহার আমি কী করিতে পারি? পাহাড়ে লইয়া গিয়াছে, কী সমুদ্রের ভিতর লুকাইয়া রাখিয়াছে, তাহা আমি কী করিয়া জানিব? ফকির সাহেব! তোমার স্ত্রীকে আনিয়া দেওয়া আমার সাধ্যাতীত।" এই কথা শুনিয়া আমির মাথা হেঁট করিয়া সেইখানেই বসিয়া পড়িলেন, চক্ষু দিয়া টপ্ টপ্ করিয়া জল পড়িতে লাগিল। দুর্বাসা মুনির জাতি! যেমন কঠিন, তেমনি কোমল! সেই জলেই ব্রাহ্মণের মন ভিজিয়া একেবারে গলিয়া গেল। ব্রাহ্মণ বলিলেন — "শুন ফকিরজি! তোমাকে মনের কথা বলি --- প্রকাশ করিও না। তাহা হইলে রোজা বলিয়া আমার যা কিছু মান-সম্ভ্রম-প্রতিপত্তি হইয়াছে, সকলই যাইবে। তোমাকে সত্য করিয়া বলিতেছি, আমি প্রকৃত রোজা নই, ভূত ছাড়াইবার একটি মন্ত্রও জানি না। এমন কি, গায়ত্রী পর্যন্ত জানি না, আর লেখাপড়া বিষয়ে, ক-খ পর্যন্ত শিখি নাই। তবে এইমাত্র বলিতে পারি যে, আমি একজম পরম নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ। চৌকায় বসিয়া খাই। আজকালের ইংরেজি-পড়া বাবুভায়াদিগের মত নই।" আমির বলিলেন — "সে কী মহাশয়! তবে আপনি মহাজনকন্যার ভূত ছাড়াইলেন কী করিয়া?" ব্রাহ্মণ উত্তর করিলেন — "সে কথা তোমাকে আদ্যোপান্ত সমস্ত বলিতেছি। প্রকাশ করিও না, তাহা হইলে আমার বড়োই মন্দ হইবে।" আমির বলিলেন — "আল্লার কসম, আমার মুখ দিয়া একথা কখনই বাহির হইবে না।"